প্রথম বার

মালতী জোশী

অনুবাদ ঃ শীলা সরকার

লেখক পরিচিতি ঃ মালতী জোশী আধুনিক কালের হিন্দী সাহিত্যে এক সুপরিচিত নাম। মাতৃভাষা মারাঠী হলেও তার দীক্ষা হিন্দীতে এবং এই ভাষাতেই সাহিত্য সাধনা করে চলেছেন। জন্ম অবশ্য কলকাতাতেই। প্রথম যৌবনে গান ও কবিতাই বেশী লিখতেন — ছোট গল্প লিখতে শু করেন। শিশু সাহিত্যেও তার হাত মিষ্টি। ১৯৭১ সালে "ধর্মযুগ"-এ তার প্রথম গল্প ছাপা হয় এবং প্রথম বই "পাষাণযুগ" ১৯৭৭-এ। তারপর আর পিছন ফিরে তাকাননি। তার অনেক গল্প নাট্য রূপান্তর হয়ে আকাশবাণীতে প্রচারিত। অনেক গল্পের টেলিসিরিয়ালও হয়েছে। তাছাড়া, ইংরাজী কন্নড় এবং গুজরাটী ভাষায় তার বেশ কিছু গল্প অনূদিত হয়েছে। ১৯৮৩ সালে কলকাতার "রচনা সংস্থা" তাকে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করেছে তার সাহিত্যকৃতির জন্যে। "প্রথম বার" গল্পটি মালতী জোশী কী কাহানিয়াঁ" ছোটগল্প সংকলনের বিখ্যাত গল্প "পহেলী বার"-এর অনুবাদ।

দিব্যা আর ওর বাবা চটপট সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল। ওদের পেছনে পেছনে হোটেলের কুলিটাও জিনিসপত্র নিয়ে দৃষ্টির বাইরে অদৃশ্য — আমিই শুধু ভারী পা ফেলে একটা একটা সিঁড়ি গুনে গুনে উপরে উঠছিলাম। মনে মনে এমন রাগ হয়েছিল আমার। একটা লিফট্ সহ হোটেল খুঁজে নিলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত! কখনও কখনও এমন কিপ্টেমি করে যা বলার মত নয়। পনের বিশটা সিঁড়ির পরে আবার মোড় নেওয়ার আগে বেশ প্রশস্ত একটা ল্যান্ডিং। ওখানে দাঁড়িয়ে একটু বিশ্রাম নেবার ইচ্ছে হয়েছিলো কিন্তু তার আগেই দেখতে পেলাম ওখানে কে যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে। সম্ভবত আমার আসতে দেরী হচ্ছে দেখে বেচারীকে বাধ্য হয়ে বিশ্রাম নিতে হচ্ছে। ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গীতে হেসে ওর দিকে তাকালাম, তারপর অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম।

স্মৃতির আলোকছটা সেখানে যে দাঁড়িয়েছিল তার মনেও বোধ হয় ঝিলিক দিয়ে উঠল। কারণ পরমুহূর্তেই সে মুখর হয়ে উঠে, 'আরে সুমন তুমি? তুমিতো সুমনই..... তাই না?'

আমি মাথা ঝাকিয়ে স্বীকৃতি জানালাম — 'আমাকে চিনতে পেরেছো তো?..... আমি কল্পনাথজীর ছেলে শ্রবণ।'

'হ্যাঁ চিনতে পেরেছি — তবে অনেকদিন হয়ে গেছে তো..... তাই একদম.....'
'হ্যাঁ ব্যাপারটা তাই ..... তুমি যতক্ষণ একেবারে কাছে না এসেছো আমার মনেও ঠিক স্ট্রাইক করেনি।'

মনে মনে ভাবি, কি করেই বা করবে? তখনকার কোন কিছু কি আমার মধ্যে অবশিষ্ট আছে। 'আচ্ছা সি ইউ' হাত উঠিয়ে সে তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেল। হঠাৎ আমার মনে হল আমার পা আর মন দুটোই যেন খুব ভারী হয়ে

উঠেছে। কোনমতে নিজেকে ঠেলে ঠুলে নিয়ে ওপরে পৌঁছলাম। ওরা সত্যিই চিন্তিত হয়ে পড়েছিলো। দিব্যকে দেখলাম একেবারে সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে। উদ্বিগ্ন গলায় প্রশ্ন করলো 'তা তুমি কোথায় ছিলে এতক্ষণ?'

'একটু বিশ্রাম নিচ্ছিলাম রে। বাবাঃ এ কি হোটেল না গোয়ালিয়রের দুর্গ! চড়তে চড়তে আমার তো একেবারে দম ফুরিয়ে গেছে।'

দিব্যা মমতামাখা হাতে আমার হাত ধরে ঘরে নিয়ে গেল। ঘরে ঢুকে ধপ করে বসে পড়লাম — হাপরের মতো নিশ্বাস চলছিল।

ক্লান্ত হয়ে চোখ বন্ধকরে বসে রইলাম বেশ কিছুক্ষণ। মাথার উপর পাখাটা বন্ বন্ করে ঘুরছে। ও বোধহয় কিছু জিজ্ঞেস করলো কিন্তু তার উত্তর দেবার শক্তিও যেন আমার মধ্যে ছিল না। তবে খুব বেশী হ'লে পাঁচ সাত মিনিট। তারপরেই ঝটপট উঠে চাবির গোছা নাড়াচাড়া করতে করতে বললাম, 'দিব্যা — দেখতো কলে জল এসেছে কিনা? যদি এসে থাকে তবে স্নান করে নেব। জার্নির ক্লান্তিটা তাহলে যাবে'।

'আরে তাড়াহুড়ো করছো কেন? স্নানটা একটু পরে করলেও চলবে। আগে চাটা তো খেয়ে নাও।' ও বলে উঠল।

'জানি না কোন জন্মে তোমার চা আসবে' গজ গজ করতে করতে কাপড় চোপড় নিয়ে বাথমে ঢুকে গেলাম। দরজা বন্ধ করে প্রথমেই আয়নায় নিঝের চেহারার দিকে তাকালাম। ছত্রিশ ঘন্টার জার্নিতে নিজের ক্লান্ত বিধবস্ত ম্লান মুখ দেখে আম ার কান্না পেয়ে গেল।

আজকেই কি এই সময় তার সঙ্গে দেখা হওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল? কি ভাবল সে। নিশ্চই স্বস্তিতে নিশ্বাস ফেলে ভেবেছে। বেঁচে গেছি। আর অনেক বছর আগে নিজের নেওয়া সিদ্ধান্তে মনে মনে বেশ খানিকটা পিঠ চাপড়ে নিয়েছে। এরপর কেমন যেন একটা জেদ চেপে গেল। ঘসে ঘসে অনেকক্ষণ ধরে চুলের ময়লা উঠিয়ে স্নান শু করলাম। ঠান্ডা জলের ছিটে দিতে লাগলাম যাতে মুখের শুকনো ম্লান ভাবটা কেটে গিয়ে একটা সতেজতা ফিরে আসে। দরজায় যদি নক করার শব্দ না হোত তাহলে আরও যে কতক্ষণ স্নান করতাম তার ঠিক নেই। এত করেও মনের মধ্যে যেন কোন তৃপ্তির ভাবই অ াসছিল না।

বাইরে এসে দেখি চা এসে গেছে। ওরা দুজনে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। আমি সোজা ড্রেসিং টেবিলের সামনে গিয়ে বসে বসলাম, 'দিবি চিনিটা দে তো একটু'।

'আরে আগে চা-টাতো খেয়ে নাও ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে যে'। ও বলে ওঠে।
'ব্যাস এক মিনিটের মধ্যেই আসছি। এক মুঠোতে চুল, কিই বা দেরী হবে — না হলে কেউ এসে গেলে, খুব বিশ্রী ল াগবে।'

আরে বাবা কেউ আসবে না, আমি কালকের কথা লিখেছি। একদিন আগে আসার উদ্দেশ্য এই যে জার্নির ক্লান্তিটা ত াহলে দূর হয়ে যাবে। এই জন্যেপ্রথম কথা — কেউ আসবে না। আর হঠাৎ যদি এসেই পড়ে তারা দিব্যাকে দেখতে অ াসবে তোমাকে নয়।'

'আচ্ছা, আমি তা হলে পেত্নী সেজে বসে থাকব' বলেই চিনীটা ছুঁড়ে ফেলে দিলাম।

ও উঠে আমার পাশে চলে এল। আর এক কাপে চা ঢেলে জোর করে আমার ঠোঁটের সাথে লাগিয়ে বলল, 'শুধু শুধু স্মার্ট হবার চেষ্টা কোরোনাতো, আগে চা খেয়ে নাও, চা ছাড়া তোমার যে কী অবস্থা হয় সেটা আমি খুব ভালই জানি।'

বাধ্য হয়ে চা খেতেই হোল, আর সত্যি কথা বলতে কি বেশ তৃপ্তি পেলাম। আসার সময় রেলওয়ে স্টেশনে জলের মতো চা খেতে খেতে আমি একেবারে হয়রান হয়ে পড়েছিলাম।

আমাদের এই মান অভিমানের পর্ব শু হতেই দিব্যা বুদ্ধিমতীর মত বাথমে ঢুকে গিয়েছিলো। এই জন্যে ওর চোখের দুষ্টুমীভরা হাসিটা চুপচাপ হজম করে নিলাম। সত্যি সত্যি মনটা বেশ হালকা হয়ে গেলো। খুশী খুশী মনে গুণ গুণ করতে করতে চুলটা বেঁধে মেকআপ সেরে সুটকেস খুলে বসলাম। কিন্তু কি পরবো সেটা বুঝতে পারছিলাম না। মাত্র দু'তিনদিনের ব্যাপার — এ জন্যে শাড়ী বেশী আনিনি। গোনাগুনতি যে কটা তাও আবার সেন্সর হয়ে এসেছে। শাড়ীগুলো উল্টে পাল্টে দেখে মেয়ের ওপর এমন রাগ হলো। প্রিয়া আজকাল খুব বেশী বসিং করতে শু করেছে। এত খবরদারি করে যে আমি একেবারে বিরক্ত হয়ে যাই — 'এই শাড়ীতে তুমি খুব মোটা দেখাও, এটা বড্ড গডি, এটা বাজে শাড়ী, এটাতো একবারে ওলড ফ্যাশানের।' লোকে ঠিকই বলে, মেয়ে বড় হয়ে গেলে মায়ের সাজগোজ ঘুঁচে যায়। ঘরে আলমারী ভর্তি শাড়ী কিন্তু আমার স্যুটকেসে কি আছে? দু'তিনখানা সিল্ক, একটা লাখ্নও চিকন, একটা চান্দেরী জরী আর একখানা ফুল ভয়েল ব্যাস। হতাশ হয়ে সুটকেসের ঢাকনাটা ফেলে দিই। ও সেভ করছিলো, চমকে বলল 'কি হোল?'

'কিছু না। বড্ড ক্লান্ত লাগছে। কিছুক্ষণ শুয়ে থাকবো।'
'হুঁ, পথে এসেছো তো? তাইতো ভাবছিলাম এত লম্বা জার্নি করে এসেও তোমার মধ্যে এত চটপটে সতেজ ভাব কী করে বজায় আছে'।

যত্নে বাঁধা খোপার তোয়াক্কা না করেই খাটের ওপর শুয়ে পড়লাম। তখনই দিব্যা স্নান করে বেরিয়ে এসে বলল 'বাবা এবার তুমি স্নান করে নাও — আমি কাপড় রেখে দিয়েছি।'

আমি বিস্ময় বিমুগ্ধ হয়ে নিজেরই মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকি। একরাশ ঘন কালো চুল পিঠের ওপর ছড়ানো, তার থেকে মুক্তোর মত জলবিন্দু ঝরছে। সদ্যস্নাত শরীর থেকে সুগন্ধের স্রোত বইছে। সুন্দর পরিচ্ছন্ন চেহারা — দেখে মনে হচ্ছিল যেন সদ্য ফোঁটা অম্লান — সুগন্ধভরা তাজা ফুল। ওর ভেজা ভেজা সৌন্দর্যের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে চিন্তা করছিলাম — চেহারার এই অপরূপ সতেজতা সময়ের সাথে কোথায় যে হারিয়ে যায়। এই সবল উজ্জ্বল হাসি, চোখের লাজুক স্বপ্নিল দৃষ্টি, দেহের কমনীয়তা নির্মম দস্যুর মত সময় কোথায় যেন ছিনিয়ে নিয়ে যায়? কেনই বা নেয়?

অজান্তেই কখন ঘুম ঘুম ভাব এসে গিয়েছিলো। দিব্যার ডাকাডাকিতে তন্দ্রা ভাঙল। 'মা ওঠো না। তৈরী হয়ে নাও।'

'কোথায় যেতে হবে রে?' হাই তুলতে তুলতে জিগ্যেস করলাম।

'এমনিই ঘুরতে। শহরে একটা রাউন্ড দিয়ে আসব।'
এইবার ভাল করে তাকিয়ে দেখি বাবা আর মেয়ে দুজনেই তৈরী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বললাম 'আমি যদি না যাই? বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছি রে।'

'কেন এখন আবার কি হোল? একটু আগেইতো খুব স্মার্ট হবার চেষ্টা করেছিলে' ও ঠাট্টা করার সুযোগটা ছাড়লো না।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ স্মার্ট হবার চেষ্টা করেছিলাম — কিন্তু হতে পারিনি। কারণ আমি একটা অত্যন্ত আল্সে বোকা আর নির্বোধ মেয়ে।'

'মেয়ে' — বলেই দিব্যা হাতের পাতায় মুখ লুকিয়ে ফিক করে হেসে ফেলল। এতে আরো রেগে গেলাম।

'দিবি, আমাদের একজন সুপারভাইজার ছিলেন — হান্ডা সাহেব। বৌয়ের সম্বন্ধে বলতেন — মনজিতের মা খুব সরল মেয়ে। ভেরী ইনোসেন্ট'।

আমাদের মধ্যে কেমন একটা ঝগড়া মনোভাব জেগে উঠলো। চিৎকার করে বললাম। 'একই গল্প আর কতবার শোনাবে — এক আধটা নতুন হাসির গল্প শিখে নাও, অন্তত শ্রোতাকে যাতে বোর হতে না হয়।'

আচ্ছা দিবি, এবার একটা নতুন জোক্ শোন — একদম আসল 'তোর মার এক বান্ধবী ছিল মিসেস পাল। প্রায়ই বলত, 'মিসেস দুবে আই য়্যাম ভেরী লাকি। আমার কাছে ভাল হাজব্যান্ডআছে' ও তেমনি মজার ভঙ্গীতেই বলে।

দিবি শিউরে উঠে বলল — 'হাজব্যান্ড তো নয়। মনে হয় বাড়ির চাকর।'

হ্যা, সে রকম ভাবে চিন্তা করলে দুটোর মধ্যে পার্থক্য অবশ্য বিশেষ কিছু নেই।' নকল গাম্ভীর্যের সঙ্গে ও মন্তব্য করে। বাবার এই অভিনয় দেখে খিল খিল করে হেসে ওঠে দিব্যা। আর অকারণেই আমার মাথা আরো গরম হয়ে গেল, 'এখন থেকে এই সব ছোট ছোট কথাতেই হিঃ হিঃ করে হাসা বন্ধ করো।

তুমি এখন আর কচি খুকীটি নও।'
দিব্যার হাসি মাঝ পথে থেমে গেল। মুখখানা ম্লান হয়ে গেল। সম্ভবত ব্যাপারটা ওর বাবার ভাল লাগলো না। তাই বলে উঠল 'কাম অন বেবী। লেট আস মুভ। আর মাকে বলে দাও আমরা ফিরতে ফিরতে যেন নিজের মুডটা ঠিক করে রাখে। যাতে রাতের খাবারটা আমরা শান্তিতে খেতে পারি।'

দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে ওরা চলে গেল দুজনে।
ঐ আওয়াজটা আমার বুকে হাতুড়ীর ঘা মারল। আমি তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলাম। কিন্তু সত্যিতো এতটা অফ্ হলাম কেন! দিব্যার ঐ উচ্ছল নির্মল হাসি আমাকে কি ক্ষত বিক্ষত করেছিল? ছোট ছোট কথায় হেসে ওঠার বয়েসটা অনেক পেছনে ফেলে এসছি। এই জন্যেই কি আমি এত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলাম?

'পহলে আতী থী হর বাতে পর হঁসী
অব কিসী বাত পর নহী আতী..
বাঃ বাঃ সুমনজী এ সব হচ্ছে কী? একেবারে শের শায়রী শু করে দিলে। কে জানে এরপর হয়তো গুন গুন করে গেয়ে উঠবে — 'ইস লিয়ে খড়া রঁহা কি তুম মুঝে পুকার লো'

অথবা
'সুবহ্ ন আঈ, শাম ন আঈ
জ্ঞ জিস দিন বরী ইয়াদি ন আঈ।'

সত্যি তো, এ আমার হলো কী? মনের কোনো গোপন কক্ষ থেকে অজস্র গান আমার ঠোঁটে গুঞ্জন তুলতে চাইছিল। আমি নিজের ঘর সংসার সন্তানদের নিয়ে ব্যস্ত এক গৃহবধূ। কিন্তু হঠাৎ আমার মন এভাবে কাব্যময় হয়ে উঠেছে কেন? হোটেলের এই বিল্ডিংয়ে কোন বিশেষ একজনের উপস্থিতির অনুভব আমার চেতনায় ঝংকার তুলছে। একেই কি বলে প্রেম। তাই যদি হলে আমার এই অনুভব কোথায় লুকিয়ে ছিলো এতদিন? স্মৃতির দেহলীতে দাঁড়িয়ে থাকা এই লাজুক মেয়েটা এতদিন কোথায় ছিলো? আর এ যদি প্রেম না হয় তাহলে এই অস্বস্তি, এই অস্থিরতা কেন? ওই লোকটির সঙ্গে আমার তো কোনো সম্পর্ক নেই, তা হলে?

অবশ্য বেশ মজবুত একটা সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা হয়েছিল কোন এক সময়ে। কিন্তু তাতে আমার নিজের ভূমিকা ছিল কতটুকু। যা ঘটেছিল সব গুজনদের কৃপায়। তখন আমার কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণ। আমার ছোটকাকু সেই সময় পড়াশোনার জন্য আমাদের বাড়িতে এসেছিল। তার কাছ থেকেই জেনেছিলাম, কল্পনাথজীর ছেলে। এতদিন শুধু কল্পনাথজীর নামই শুনেছি। ওই আমার বাবার মতই ফৌজদারী উকিল। কিন্তু কাকুর কাছ থেকে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়ার পর নাম ও পরিবার যেনএকটু বিশেষ হয়ে উঠল সবার কাছে। এর পর বেশ পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা বাড়ানোর ব্যবস্থা নিলো। মাঝে মাঝেই বাড়িতে কোন না কোন উৎসবের ব্যবস্থা — তাতে আর কারো না হোক কাকুর বন্ধুর নিমন্ত্রণ অবশ্যই থাকতো। আমাকে পরিষ্কার ভাবে কেউ কিছু না বললেও বড়দের ফিস্ ফিস্ কথাবার্তা ছোটদের হাসি ঠাট্টা অনেক না বলা কথার আভাস দিয়ে যেত। নিজের অজ্ঞাতেই মনে মনে একটা সুন্দর কল্পলোক তৈরী করে নিয়েছিলাম। স্বপ্নের একটা শ্বেত পাথরের মন্দিরে দেবতার মূর্তি বসিয়ে তার প্রাণ প্রতিষ্ঠাও করে ফেলেছিলাম — চিন্তা করলে এখন হাসি পায়। কিন্তু ওই সময় ওটাই ছিলো সবচেয়ে বড় সত্য।

কতদিন পরে আজ আমার সেই ভী কিশোরীবেলায় প্রথম স্বল্প মনের গভীরে বাজছে আর সেই আবেগ আমার সমস্ত অস্তিত্বই আমূল কাঁপিয়ে তুলেছে।

আমরা যেরকম স্থির করেছিলাম, ঠিক সেই প্ল্যান অনুযায়ী দ্বিতীয় দিন ফোনে গিরিজাশংকরজীকে আমাদের আসার খবর জানানো হলো। খবর পাওয়ামাত্র তিনি দুপুর বেলা ওখানে আমাদের খাওয়ার নিমন্ত্রণ জানালেন। আমার বেশ সংককোচ হচ্ছিল। ও বললো 'এটাই ভাল হবে। যত বেশীক্ষণ ওখানে থাকতে পারবো — ওদের ঘর পরিবার সম্বন্ধে গভীর ভাবে জানতে পারবো। ড্রইংমকার্টসী তো সবাই দেখাতে পারে।'

প্রায় দশটা নাগাদ তৈরী হয়ে আমরা নীচে নেমে এলাম। রাস্তায় অসংখ্য গাড়ির চলাচল। চারদিকে অফিস যাত্রীদের ছোটাছুটি। এ অবস্থায় নিয়েদের জন্য একটা ট্যাক্সিও পাচ্ছিলাম না। ওরা নিজেদের গাড়ি পাঠাতে চেয়েছিলেন, আমরাই ভদ্রতা করে নিষেধ করেছিলাম। এখন বেশ আফশোষ হচ্ছে। এইরকম সময়ে একটা ট্যাক্সি এসে আমাদের সামনে এমনভাবে সামনে এমনভাবে দাঁড়ালো যেন আমরাই ডেকেছি। তাড়াতাড়ি সবাই সামনে এগিয়ে গিয়ে দেখলাম — ক্যামেরা, ওয়াটার বটল ও আরো অন্যান্য জিনিসপত্র ঘেরা এক দম্পতি ট্যাক্সিতে বসে ট্যাক্সি ভাড়ার হিসেব করছিল। অবশ্য এটাই ঠিক। লোক এখানে দুর দূরান্ত থেকে ঘোরার জন্যেই তো আসে, আমার মতো ঘরে বন্দী হয়ে থাকার জন্যে কেউ আসেনা। 'গুড মর্নিং এভ্রিবডী'— একদম চম্‌কে উঠলাম। কাল থেকে এর সম্বন্ধেই চিন্তা করে চলেছি — অথচ এখন সামনে দেখেও চিনতে পারিনি। শার্ট-কোর্ট চোখে গগলস। একদম অচেনা লাগছিলো।

'সাহেব বাহাদুরের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করাবেনা সুমন' — আর একবার চামকে উঠি। শু হয়ে গেল আমাদের আলাপ পরিচয়ের পর্ব। কিন্তু আমার মন তাতে একদম ছিলোনা। আমি মুগ্ধ হয়ে তার পাশে দাঁড়ানো চম্পাবরণী মহিলাটিকে দেখছিলাম। দুজনকেই দাণ স্মার্ট আর ইয়ং লাগছিল। কালস্রোত যেন ওদের না ছুঁয়েই বয়ে চলে গেছে।

‘নীতা — সুমনের বাবা আমার ড্যাডি কলিগ ছিলেন। ওদের মধ্যে ঘনিষ্ট বন্ধুত্ব ছিলো।’ সে স্ত্রীর কাছে আমার পরিচয় দেয়। ট্যাক্সিতে বসে কথাটা আমার কানে গুঞ্জিত হতে থাকে। সেই সঙ্গে মনে মনে আরো কিছু কথা জুড়ে দিই। ‘জানো নীতা এরা বেশ কায়দা করে আমার জন্যে জাল বিছিয়ে ছিলো। ফেঁসেই যাচ্ছিলাম। নেহাৎ সাহস আর বুদ্ধির জেরে বেঁচে গিয়েছি। ড্যাডি বলেছিলেন বাবা যদি বাঁচতে চাস একবারে ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে যা। ব্যাস, পালিয়ে গেলাম ইংল্যান্ড। একেবারে ওর বিয়ের পরেই ফিরেছি।’

কথাগুলো অমার কল্পনা প্রসূত নয় — আমার নিজের কানে শোনা। শ্রবণ বিলেত থেকে ফেরার পর কল্পনাথজী বেশ বড়ো করে পার্টি দিয়েছিলেন। ঘটনাত্রমে আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম সেখানেই সব কিছু শুনতে পাই। শ্রবণ বন্ধুদের মধ্যে বসে খোসমেজাজে সবাইকে গল্প শোনাচ্ছিল আর বন্ধুরা খুব হেসে তার বুদ্ধির তারিফ করছিলো। ঐ হাসি বহুদিন পর্যন্ত আমার মনে কাঁটার মতো বিঁধতো।

গিরিজাশংকরজীর পরিবার দেখে মন খুব প্রসন্ন হয়ে উঠলো। বাড়িটা যেমন সুন্দর, সাজসজ্জাও তেমনি সুচিপূর্ণ। ছেলেরা বেশ ভদ্র, বৌরাও নম্র স্বভাবের। ভদ্রলোক নিজেও সৌম্য ও শান্ত। স্ত্রীও মৃদু মিষ্টভাষিনী। শারিরীক দিক থেকেও যদিও পঙ্গু — কিন্তু সংসারী কতৃত্ব সম্পূর্ণ ভাবে তারই হাতে। নিজের পঙ্গুত্ব তিনি সাহসের সঙ্গেই মেনে নিয়েছিলেন, পড়াশোনা করেই সময় কাটাতেন এই বিদূষী মহিলা। দিব্যাকে পাশে বসিয়ে উনি এত রকমের প্রশ্ন করতে লাগলেন — আমিতো ঘাবড়েই গেলাম। কিন্তু মেয়ে এতটুকু ইতস্তত না করে সুন্দর বিনম্রভাবে সব প্রশ্নের উত্তর দিল বেশ সহজভাবেই। আমিও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলাম।

লক্ষ্মী ও সরস্বতী দুই দেবীর দুর্লভ মিলন হয়েছে যেন এই বাড়িতেই। তিন ছেলে ইঞ্জিনিয়ার। নিজেদের বিরাট ব্যাবসা তারাই দেখাশোনা করে। আর ছোটছেলে যার জন্যে আমরা গিয়েছিলাম — ইউনিভার্সিটির গোল্ড মেডেলিস্ট।

সত্যি কথা বলতে কি মেয়ের জন্যে যে রকম ঘর-বরের কল্পনা করতাম এই বাড়িতে সব কিছুই ছিলো। মনে মনে মেহতা সাহেবকে অনেক ধন্যবাদ জানালাম। — উনি না বললে আমরাতো জানতেও পারতাম না। এত দূরে এই হায়দ্রাবাদ শহরে অবিবাহিত এইরকম হীরের টুকরো ছেলে রয়েছে আমাদের ‘ঘরাণা’র!

সারাটা দিন খুব সুন্দর ভাবে কেটে গেলো। ওদের ভদ্রতা আর আতিথ্যে আমরা একেবারে অভিভূত। ফিরে এসে দিব্যার আগ্রহে একটা অতি সাধারণ সিনেমা দেখেও মুড খারাপ হোল না।

পরের দিন সারা দুপুর সালারজং মিউজীয়াম দেখা হোল। সেই বিশ্ববিখ্যাত সংগ্রহশালা দেখতে দেখতেও আমার মন দিব্যার বিয়ের প্রস্তুতির চিন্তায় মগ্ন হয়ে রইলো। এই আয়োজনের সামনে পৃথিবীর সব কিছুই যেন মূল্যহীন।

চারটে নাগাদ আমরা হোটেলে ফিরে এলাম। এসেই পতিদেবতা বলে উঠল ‘শোন, পাশের ঘরের ওদের চায়ের সময় ডেকে নিচ্ছি।’

‘পাশের ঘরের ওরা মানে?’
‘ওই যে তোমার শ্রবণদা’
‘সে আমার কোন আত্মীয় নয়। চায়ের সময় ওদের ডাকবার দরকার নেই’— বিরক্ত হয়ে আমি বললাম।

‘ঠিক আছে তোমার কেউ নাই বা হোল, কিন্তু সকাল বেলায় ওদের ঘরে কোল্ড ড্রিংক খেয়ে এসেছি — কার্টসী ডিমান্ড।

‘তাহলে ডেকে নাও। জিগ্যেস করার নাটক কেন করছো। তোমারতো সবসময় খালি ভীড় বাড়াবার মতলব, সেটা ঘরেই হোক বা বাইরে, কিছু যায় আসে না।’ আমি অকারণে রেগে বলি। তবুও শেষ পর্যন্ত দিব্যাকে নিমন্ত্রণ করতে পাঠিয়ে দিল।

সবার আগে এলোমেলো ঘরটাকে একটু গোছগাছ করে নিলাম। ও খাবারের অর্ডার দিতে গেল। আমি স্যুটকেশ খুলে বসলাম। সেই গোনাগুনতি শাড়ী কটাই আমাকে ভেংচী কাটছিল যেন। দিব্যার এ্যাটাচী থেকে একটা চটকদার শিফন বের করে কোলের উপর রেখে নিজের শ্রান্ত ক্লান্ত চেহারার দিকে তাকিয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। হঠাৎ মনে হ’ল, আমি এরকম কেন করছি? কেন এই আকুলতা! যখন শরীর এত বেডৌল ছিল না, চেহারা ছিলনা লাবণ্যহীন বা চুলের মাঝে রূপোর ত ার দেখা যেত না — এই লোকটিতো তখনও কোন আকর্ষণ বোধ করেনি। তাহলে আজ আর এই ব্যগ্রতা কেন? এই চিন্তার সাথে সাথেই আমার সমস্ত উত্তেজনা শেষ হয়ে গেল, মন হয়ে উঠলো হাল্কা। রোজকার মতো শুধু হাতমুখ ধুয়ে বসে গেলাম। শাড়ী বদলাবার ইচ্ছেও হোল না।

দিব্যা একেবারে ওদের সঙ্গে করে নিয়েই এলো। খেতে খেতে শ্রবণ বলল, ‘হুসেন সাগর দেখতে যাবার পোগ্রাম করেছি আপনারাও চলুন না, বেশ ভাল লাগবে।’

ও উত্তর দিল, ‘আমরা ক্লান্ত বোধ করছি। বিশেষ করে শ্রীমতীর আজকের কোটা পুরো হয়ে গেছে। তবে আপনারা দিব্য াকে নিয়ে যেতে পারেন।’

মেয়েতো আনন্দে চিৎকার করে উঠল ‘থ্যাংক ইউ ড্যাড।’ সবার চা খাওয়া হতে হতে ও তৈরী হয়ে নিল। সেই চটকদার জামুনী শিফনে ওকে এত সুন্দর লাগছিলো। ভাবলাম আমারই না নজর লেগে যায়।

‘কিন্তু তবুও.....’
‘আরে তোমার এত সঙ্কোচ কেন? এঁরা কি হনিমুন ট্রিপে এসেছেন? হাই স্কুলে পড়া ছেলেকে ঘরে রেখে এসেছে জানো কী? আর দিব্যাও তো বারবার এতদূরে আসতে পারবো না। যা দেখতে চায় দেখে নিতে দাও।
‘মানে? ওতো এখানেই.....’

‘না। ..... গিরিজাশংকরজীর কাঠ থেকে রিফিউজাল এসে গেছে।’ স্পষ্ট স্বরে কথাগুলো বলে ও মুখ ফিরিয়ে নিল।

আমার মনে হোল মাথাটা যেন শূন্য হয়ে গেছে, হতবাক হয়ে আমি বোবা দৃষ্টি মেলে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম। কিছুক্ষণ বাদেও তেমনি নিস্তাপ ভাবেই — সকালবেলা কিভাবে গিরিজাশংকরজীর ফোন এসেছিল। ছেলে বিয়েতে হঠাৎ অসম্মতি জানিয়ে যে অভদ্র আচরণ করেছে তার জন্য তিনি বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন কিভাবে — সব বিস্তারিতভ াবে বলল।

ওর বলা প্রত্যেকটি কথা আমার কানে প্রচন্ড আঘাত করতে লাগলো। মুহূর্তে এই সুন্দর শহর আমার কাছে নরকের চেয়েও কুৎসিৎ হয়ে উঠলো। মনে হোল দমবদ্ধ করা এই পরিবেশ থেকে বেড়িয়ে পড়ি, চুলোয় যাক রিজার্ভেশন।

‘আমি বাজার থেকে ঘুরে আসছি। প্রিয়া আর কপিলের জন্য কিছু নিয়ে আসবো। তোমার জিনিষপত্র সব গুছিয়ে নাও গ াড়ি একদম সকাল সাতটায় ছাড়ে।’

আমি কোন উত্তর দিলাম না, আসলে উত্তর দেবার মতো কোন শক্তিই আমার মধ্যে অবশিষ্ট ছিল না। ও অবশ্য উত্তরের অপেক্ষা নাকরেই চুপচাপ উঠে চলে গেল।

আমি মনে মনে সুটকেসে রাখা আংটিটার কথাই চিন্তা করতে লাগলাম — ওটা আমি লুকিয়ে নিয়ে এসেছিলাম। ইচ্ছে ছিল সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে গেলে একেবারে আশীর্বাদ করে যাব। ঘরের কোণ অসহ্য হয়ে উঠলে ব্যালকনিতে চলে এল াম। নীচে সমস্ত রাস্তা আলোর বন্যায় স্নান করছে, হাজার রামধনু রংয়ের আলোর ছটায় ঝকমকে। চরিদিকে বিভিন্ন ধরনের গাড়ির শব্দ। সব মিলিয়ে যেন উৎসবের সমারোহ।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পায়ে ব্যথা শু হয়ে গেল। তবুও আমি ওখানে দাঁড়িয়ে রাস্তার সাইনবোর্ড পড়তে লাগলাম। ঘরের ভেতরের স্তব্ধতায় ফেরার সাহস হল না।

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর শ্রবণদের ট্যাক্সী এসে থামলো। ওদের সাথে দিব্যাকে নামতে দেখে মনের মধ্যে হঠাৎ একটা অদ্ভুত চিন্ত া বিদ্যুতের মতো চমকে উঠলো। সেদিন সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় শ্রবণের সাথে দেখা হয়েছিলো। গিরিজা শংকরজীর বা ড়িতে যাওয়ার সময়ও ওরা সপত্নীক সামনে এসে উদয় হওয়া যেন এক অশুভ ইংগিত। মনে মনে ভাবি, আমি তখনই কেন বুঝতে পারিনি। আমার জীবনের প্রথম স্বপ্নতো ও-ই ছিলো, ও নিজেই সে স্বপ্ন ভেঙে গুড়িয়ে দিয়েছিলো। দিব্যার স্বপ্নকে সে কী করে সার্থক হতে দেবে।

'হায় মাম্মা, ইউ মিস্‌ড এ লট।' দিব্যা লাফাতে লাফাতে সবার আগে এসে কলস্বরে বলতে থাকে। আমার গলার জড়িয়ে ধরে বলে 'এত সুন্দর সাইট মা, ওঠার ইচ্ছেই করছিল না। সানসেট তো এমন ওয়ান্ডারফুল কী বলবো। মাম্মা তোমারাও গেলে ভাল হোত।'

'আরে এত আফশোষ করার কি আছে বলতো? — সামনে বার বাবা-মাকে নিজের গাড়িতে করেই সব জায়গা ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিও, ব্যাস। সূর্য তো আরও বহুকাল উদয় হবে, অস্তও যাবে।' — আওয়াজটা শ্রবণের। ওরা দুজনে কখন যে প াশে এসে দাঁড়িয়েছে টেরও পাইনি। আমি আশর্চ্য হলাম শুধু এই ভেবে যে এসব কথা এদের বললো কে?

দিব্যার দিকে তাকিয়ে দেখলাম — লজ্জায় ওর মুখ লাল হয়ে উঠেছে। 'হ্যায় আংকল অপনিতো ব্যস.....'

আমি শান্ত দৃঢ় স্বরে বললাম 'দিবি মা, যাওতো ভেতরে গিয়ে গোছগাছ শু করো। না'হলে তোমার বাবা এসেই হৈ চৈ শু করে দেবেন।'

'ভারী সুন্দরী আর মিষ্টি মেয়ে' — ও ভেতরে যেতেই নীতা বলে ওঠে। আমি শুকনো হেসে বললাম,
'নিজের কাছে নিজের ছেলেমেয়ে ভালই লাগে। অন্যেরও যদি ভালো লাগে তবেই না.....।'
'মানে'
'ওরা অসম্মতি জানিয়েছে।' আমি স্পষ্ট স্বরে বললাম।
'কী বলছো তুমি? কোন খুঁতটা ওর ওর মধ্যে খুঁজে পেল'
'শ্রবণজী' আমি গম্ভীর স্বরে বললাম। 'সৌন্দর্যের মাপকাঠি যার যার নিজস্ব চি অনুযায়ী হয় — এর কি কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞা আছে?

‘অবশ্যই নেই’ — অস্পষ্ট স্বরে শ্রবণ বলে।
‘আমিতো এত গিল্টী ফিল করছি কী বলবো। সারা রাস্তা হাসি তামাশা করতে করতে এসেছি। এ্যান্ড শী এনজয়েড ইট’, নীতা বললো।

‘আপনি কি করে জানলেন?’
এটা এমন কি কঠিন ব্যাপার! আপনারা দুজনে মেয়েকে নিয়ে এতদূরে এসেছেন তাকে সাজগোজ করিয়ে কোথাও নিয়ে গেলেন। ইট ওয়াজ এ্যান ইজি গেম। একটা অনুরোধ দিদি, দিব্যাকে এখনই কিছু বলবেন না প্লিজ। যা হোক কিছু একটা বানিয়ে বলে দেবেন। বেচারী এত খুশী ছিল এতক্ষণ। ভাবতেই যেন কেমন লাগছে।’ নীতা অনুনয়ের ভঙ্গীতে বললো।

‘এ ব্যাপারে মেয়েরা অনেক চালাক হয় নীতা — বানানো কথার পেছনের সত্যিটা ওরা সহজেই ধরে ফেলে।’

‘হ্যাঁ তা ঠিক তবুও.....’

‘হ্যাঁ একটু সতর্ক তো হতেই হবে। একেবারে প্রথমবার কিনা। এবার ওর মনের ওপর খুব সস্নেহ প্রলেপ দিয়ে সব ভোলাতে হবে। পরে তো সব অভ্যেস হয়ে যায়, একান্ত বাস্তব হয়ে ওঠে। মন এমন কঠিন হয়ে যায় যে কোন আবেগ তাকে আর স্পর্শ করে না।

ওরা দুজনে যে কখন নিঃশব্দে আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছে বুঝতেই পারিনি।

ভিতরে এসে দেখলাম — দিব্যা দু’হাত কোলের ওপর রেখে সোফায় নিশ্চল হয়ে বসে আছে। বুঝতে পারলাম আমাদের সব কথাই ও শুনেছে। ওর ভেঙে যাওয়া স্বপ্নের ছায়া মুখের উপর সম্পূর্ণ পরিস্ফুট।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com